

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উপন্যাসের নৃতত্ত্ব : তারাশঙ্করের অরণ্য-বহ্নি

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Arman Hosain
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.7
Pages	১১৫-১২৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

উপন্যাসের নৃতত্ত্ব : তারাশঙ্করের *অরণ্য-বহ্নি*

Check for updates

সৈয়দ আরমান হোসেন*

নৃবিজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান, মানুষকে অধ্যয়ন করার শাস্ত্র। মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্চা অধ্যয়ন করাই নৃবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয় নৃবিজ্ঞানীরা বিবেচনা করেন গুরুত্বের সঙ্গে। আর মানুষের জীবন অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞানের সাথে তাই সংশ্লেষ ঘটে অন্যান্য শাস্ত্রের (discipline)। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য — সকল শাস্ত্রের সাথেই নৃবিজ্ঞানের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। সাহিত্যকে মূলত নৃবিজ্ঞানীগণ বিবেচনা করেন সংস্কৃতির ধারক বা cultural Artifact হিসেবে, যেখানে পরিস্ফুট হয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনপ্রণালি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকায়ত বিশ্বাস, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদি। আর সাহিত্য তাই হয়ে ওঠে নৃবিজ্ঞানীদের জন্য মানবসমাজ, মানবসংস্কৃতি অধ্যয়নের ও বিশ্লেষণের এক কার্যকর উৎস। একইভাবে সাহিত্যিকগণও তাঁদের সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ করতে পারেন নৃতাত্ত্বিক তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে।

সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাশৈলী ও শিল্পরূপ নৃবিজ্ঞানীরা আজকাল তাদের 'এথনোগ্রাফিতে' (ethnography) ব্যবহার করতে আগ্রহী হচ্ছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও নান্দনিকতা নৃবিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করছে। কিন্তু, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোনো সাহিত্যকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা, সাহিত্যে রূপায়িত মানুষের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। সাহিত্য কোনোক্রমেই সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় — বরং সংস্কৃতি থেকেই সাহিত্যের জন্ম, সাহিত্য ধারণ করে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক উপাদান। নৃবিজ্ঞানীগণ সাংস্কৃতিক সে-সকল উপাদান অধ্যয়ন, অনুধাবন ও বিশ্লেষণে ব্রতী হন:

> Literature becomes both a creater and creation of culture, with anthropology as observer/reader/interpreter. [১]

সুতরাং, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহিত্য এবং নৃবিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এক পরস্পরিত যোগসূত্র যা দুই শাস্ত্রের মধ্যকার সীমারেখা অতিক্রম করে, দুই শাস্ত্রই সংস্কৃতিকে জানার ও প্রকাশের অভিপ্রায়ে হয় মিথস্ক্রিয়ারত। সাহিত্য মানবসংস্কৃতির গতিময় বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তন ও চর্চায় সুগভীর প্রভাব ফেলে। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ব্যষ্টিক পর্যায়ের (micro level)। তাই নৃবিজ্ঞানে পরিস্ফুট হয় প্রান্তিক, নিষ্পেষিত, দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়। কোনো জনগোষ্ঠী অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা-পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক ও নিবিড়। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলি, লোকায়ত-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহ অধ্যয়ন, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের উপর নৃবিজ্ঞানীদের সাফল্য নির্ভর করে। সাহিত্যে ফুটে ওঠে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন,

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাদের লোকায়ত আচার ও বিশ্বাস — যা নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গুরুত্ববহ, ফলপ্রসূ। ব্যষ্টিক পর্যায়ে গবেষণা করলেও নৃবৈজ্ঞানিকগণ সাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক উপাদান অধ্যয়ন ও বিবেচনা করেন বৃহৎ সাংস্কৃতিক ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। তাই নৃবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন সাহিত্যের সামাজিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক উপাদান এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিশদ ও সূক্ষ্ম উপস্থাপনকে।

২

বাংলা উপন্যাসে প্রথম পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন পরিস্ফুট হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সেখানে স্থান পায় গণমানুষের জীবন। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর প্রান্তিক ও দলিত জনগোষ্ঠীর দ্রোহ-চেতনা, নিষ্পেষিত জীবন ও জীবনাচরণ বাংলা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মার্কসবাদের প্রভাব, গ্রামশির 'হেজেমোনি'-তত্ত্ব, রণজিৎ গুহ-র দলিত সম্প্রদায়-বিষয়ক মননচর্চা জ্ঞানতাত্ত্বিক জগৎকে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। 'তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ ও সমাজ, স্বসমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ও সামাজিক শ্রেণীবৈরী ও সমকালের রাজনীতি।'[২] তারাশঙ্করের জন্ম ক্ষীয়মাণ সামন্তসমাজের এক ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারে। সুগভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন সমাজকে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চাকে। 'সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির ঐশ্বর্যে সময়শায়িত সমাজগতির রূপান্তর ও স্বরূপ সমাজবিজ্ঞানী না হয়েও আবিষ্কার করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।'[৩] এ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিই তাকে করে তুলেছে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, মানুষের জীবন অধ্যয়নে তাঁর প্রচেষ্টা সাহিত্যকে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে করেছে অমূল্য। *কালিন্দী*, *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা*, *অরণ্য-বহ্নি* ইত্যাদি উপন্যাসে তাই প্রান্তিক মানুষের জীবন বিধৃত হয়েছে সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে।

অরণ্য-বহ্নি (১৯৬৬) ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮৫৫) অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। শোষণমূলক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক নিপীড়নে জর্জরিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র বিদ্রোহ বা 'হুল' এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। আর এ বিদ্রোহকে উপলক্ষ করে রচিত *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে পরিস্ফুটিত হয়েছে এক প্রান্তিক আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনচর্চা — তাদের সংস্কৃতি, জীবনবোধ, রাজনৈতিক ধারণা ও অর্থনৈতিক ভাবনা।

উপন্যাস হিসেবে *অরণ্য-বহ্নির* সাহিত্যমূল্য ও নান্দনিকতা ঐতিহাসিকও বটে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের শিল্পরূপ বা নান্দনিকতা বিশ্লেষণের পরিবর্তে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রচনায় বিধৃত সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন। সাঁওতালদের জীবনচর্চা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, রাজনীতি ও অর্থনীতি এ-উপন্যাসে কোন দৃষ্টিকোণে ও কীভাবে বর্ণিত হয়েছে — মূলত তাই নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহের বিষয়। সাঁওতাল জীবনচর্চা অধ্যয়নে তারাশঙ্করের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সাবলীল প্রয়োগ *অরণ্য-বহ্নিকে* নৃবিজ্ঞানীদের কাছে করে তুলেছে গুরুত্ববহ। উপন্যাস অধ্যয়নের মাধ্যমে সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর জীবনকে নৃবিজ্ঞানীদের

অনুসন্ধিৎসু মন পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের অন্যতম আদি নৃগোষ্ঠী হল সাঁওতাল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আর্য-পূর্ব যুগে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রাক্‌দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) গোষ্ঠীর বসতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী।[৪] সাঁওতালরা এই প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর লোক। সাঁওতালদের আদি আবাসস্থল এবং বৈচিত্র্যময় অভিবাসন-যাত্রা সম্পর্কে রয়েছে বিভিন্ন মত। ধারণা করা হয়, সুদূর অতীতে তারা সম্ভবত আর্য অভিযানের চাপে উত্তর ভারত ত্যাগ করে মধ্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তারপর ঐতিহাসিক যুগে ছোটনাগপুর মালভূমি ও সংলগ্ন মেদিনীপুর ও সিংভূম জেলায় তারা বসতি স্থাপন করে।[৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর ২য় দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি-জনিত সমস্যার কারণে তারা আবার উত্তর দিকে অভিবাসন শুরু করে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ১৭৯০ (দশশাল বন্দোবস্ত) অথবা ১৭৯৩ (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)-এর পর বর্ধিত সদর খাজনার চাপে পিষ্ট জমিদাররা নিজেদের সম্পদবৃদ্ধির জন্য বন কেটে আবাদ ও বসতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাঁওতালদের বীরভূমে আহ্বান করে এনেছিলেন।[৬] *অরণ্য-বহ্নিতে* তারাশঙ্কর বলেছেন সাঁওতালদের 'বন কেটে চাষের ক্ষেত' তৈরির কথা। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সমতলে নেমে আসা সাঁওতালরা বনাঞ্চল কেটে সম্পৃক্ত হয়েছে কৃষিকাজে, স্থাপন করেছে নতুন বসতি। অরণ্যচারী, শিকারি জীবনে অভ্যস্ত সাঁওতালরা সমতলে এসে দেখেছে এক ভিন্ন জগত :

> ইংরেজের দেওয়ানীর পর পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরী হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালরা সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরী করে জমি ভাঙছে। হিন্দু ব্যবসাদার গৃহস্থ এরাও চাষের ক্ষেত তৈরী করে অঞ্চলটার চেহারা অনেকটা পালটে দিয়েছে।[৭]

অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত থাকায় বন কাটার ব্যাপারে সাঁওতালদের মতো দক্ষতা আর কারো ছিল না। তবে চাষী হিসেবে তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী হলেও হিন্দু চাষীদের মতো দক্ষতা তাদের ছিল না।[৮] সাধারণ মানের ছোট ছোট জমিতে মান্ধাতা আমলের কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ করে তারা উৎপন্ন করত ধান, ভুট্টা, বজরা, সর্ষে ও কয়েক ধরনের ডাল। হাড়ভাঙা পরিশ্রমে তৈরি তাদের জমিগুলো গ্রামের কাছাকাছি থাকলেও সাধারণভাবে ঘন জঙ্গলে ছিল আবৃত।[৯] জমির অনুর্বরতার কারণে সাঁওতালরা প্রায়ই তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করত। এর পিছনে মুখ্য ভূমিকা ছিল তাদের দীর্ঘ দিনের অরণ্য-জীবনের অভ্যাস। বসতি করার উদ্দেশ্যে বন পরিষ্কার করলেও বনশূন্য প্রকৃতি পছন্দ হত না তাদের। তখন তারা আবাদী জমি ফেলে গভীর অরণ্যে ঢুকে নতুন জমি উদ্ধারে নেমে যেত নব উদ্যমে।[১০]

৩

অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল বাগনাডিহি (ভগনা ডিহি) গ্রাম। ভগনা ডিহি বীরভূম জেলার দামিন-ই-কো নামক অঞ্চলে অবস্থিত। পাথর কাঁকর আর লাল মাটির অঞ্চল, শক্ত কঠিন রুক্ষ মাটি, ধুলো লাল। কোথাও রুক্ষ ধূসর প্রান্তর, কোথাও বা মাইলের পর মাইল

বিস্তীর্ণ শাল জঙ্গল।[১১] এই বাগনাডিহিই সিধু-কানুদের গ্রাম — এই গ্রামেই ১৮৫৫ সালে জ্বলে উঠেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন এই বাগনাডিহি গ্রামের সাঁওতালদের জীবন। তিনি দু-রকম সাঁওতালদের কথা বলেছেন — পাহাড়িয়া সাঁওতাল এবং নিচে নতুন আবাদি 'ডামিন' বা জঙ্গ এলাকার সাঁওতাল। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, পাহাড়িয়া সাঁওতালরা অরণ্যচারী, তারা শিকারি ও সংগ্রাহক জীবনে অভ্যস্ত। অন্যদিকে 'বাগনাডিহি'র মতো সমতলভূমিতে অবস্থানরত সাঁওতালরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল কৃষিকাজে। অরণ্যচারী শিকারি জীবন ত্যাগ করে তারা হয়ে উঠেছিল কৃষিজীবী, সম্পৃক্ত হয়েছিল সমতলভূমির বৃহত্তর সমাজের সাথে।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জানা যায়, সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষায় কথা বলা প্রোটো অস্ট্রালয়েডদের (Proto Australoid) অন্তর্ভুক্ত। তাদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, চুল কালো, ঠোঁট মোটা। মুণ্ডা, ওরাওঁ, পাহাড়িয়া এবং আরো কয়েকটি নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের এ বিষয়গুলোতে মিল রয়েছে। সাঁওতালরা লম্বাটে মুখমণ্ডল ও প্রশস্ত নাকের অধিকারী। এই চিত্রই ফুটে উঠেছে লেখকের বর্ণনায় :

> এরা অরণ্য মানুষ, কালো রঙ, পরনে মাত্র একফালি কাপড়, মাথায় বাবরি চুল; ... মেয়েরা কষ্টিপাথরে খোদাই-করা সুঠামগঠন নারীমূর্তি। ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। (তা.র, পৃ. ৩২৪-২৫)

সাঁওতালরা বাস করে দলবদ্ধভাবে । তাদের এই ঐক্যের কথা তারাশঙ্কর-এর *অরণ্য-বহ্নি*তে পরিস্ফুটিত হয়েছে একাধিকবার। সাঁওতালরা উঁচু জায়গায় তাদের গ্রাম গড়ে তোলে। এদের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর খড়ের ছাউনি দেওয়া চালা ঘর। দেওয়াল মাটির। মাটির দাওয়া, মাটির আঙিনা সুনিপুণ শিল্পিত স্পর্শে যেন সবসময় থাকে ঝকঝকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা তাদের আপন বৈশিষ্ট্য।[১২] প্রত্যেকের ঘরের পাশে কতকটা খোলা পতিত জমি থাকে যা 'কাঁকরে এবং পাথরে ভর্তি'। এই পতিত জমিতে তারা 'জনার লাগাবে। জোয়ার লাগাবে, মরদেরা কাঁড়া খুলে হাল জুড়লে।' (তা.র., পৃ. ৩৫১)

বাগনাডিহি গ্রামের সাঁওতালদের জীবনচর্চা বর্ণনায় তারাশঙ্কর বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের কথা। লেখকের ভাষায় পুরুষেরা মাত্র 'একফালি বস্ত্র' পরিধান করে। মাথায় বাবরি চুলে 'ফুল গোঁজে, কানে ফুল গোঁজে, পুতির মালা গলায় পরে হীরেমণিমাণিক্যের কণ্ঠহার পরার আনন্দ উপভোগ করে।' (তা.র., পৃ. ৩২৫)। অনুসন্ধানে জানা যায়, তৎকালীন সাঁওতাল পুরুষেরা গামছা কিংবা পাঁচ-ছয় হাত দীর্ঘ তাঁতে বোনা মোটা কাপড় পরিধান করত। যদিও বর্তমানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সে-সময়কার সাঁওতাল পুরুষদের রেওয়াজ ছিল 'একফালি বস্ত্র' পরার। সাঁওতাল মেয়েরা সাজগোজ করতে ভালোবাসে, ভালোবাসে রুপার অলংকার ও ফুল ব্যবহার করতে। লেখকের বর্ণনায় সাঁওতাল মেয়েরা সিঁথি কাটে না, সমান করে উজিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাঁধে। খোঁপায় থাকে জিজির গাঁথা কাটা ফুল, কিন্তু তাও দেখা যায় না। সেখানে থোকা থোকা হলুদ ফুল আর লাল ফুল গুঁজে রাখে। (তা.র, পৃ. ৩২৫)

সাঁওতাল নারীর পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

> এদের পরনে দু'প্রস্ত সাঁওতালী তাঁতে বোনা মোটা সুতার কাপড়, রঙিন, একপ্রস্ত কোমর থেকে নীচের দিকে, অপর প্রস্তটাকে কোমরে একপ্রান্ত গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমর আঁটসাট করে জড়িয়ে গোঁজে। গলায় ওই ওদের হীরে মানিক রঙিন পুঁতির মালা।
>
> (তা.র, পৃ. ৩২৫)

*অরণ্য-বহ্নি*তে উল্লেখ করা হয়েছে সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাসের কথা। সাঁওতালদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে রয়েছে ভাত, মাছ, এবং শাকসবজি; পাশাপাশি তারা কাঁকড়া, শূকর, মুরগি, গরু ও কাঠবিড়ালির মাংস খেতে পছন্দ করে। পাটশাক তাদের অন্যতম পছন্দের খাবার। হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পাখির ডিম তাদের খাদ্যতালিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়াও তারা কচ্ছপ খেতে পছন্দ করে। উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখা যায়, লেখককে সাঁওতালরা তাদের ঘরে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন :

> আর আমাদের বাড়ী যাবি তো আয়। দাকা (অর্থাৎ ভাত) দিব, সিন (অর্থাৎ মুরগী) দিব, আর হাঁড়িয়া (অর্থাৎ পাঁচুই মদ) খাস তো তা দিব। (তা.র., পৃ. ৩২৭)

সাঁওতালদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পাঁচুই মদ (ওরা বলে হাড়িয়া) এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ক্লান্তি মোচনের জন্য পরিবারের লোকজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দু-এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া তাদের চাই। যেকোনো উৎসবে বা আনন্দানুষ্ঠানে সমবেত নাচগান ও মাদন-ধামসার উদ্দাম কলরোলকে বিবশ অর্নিবচনীয়তায় উন্নীত করতে হাঁড়িয়ার তুল্য আর কী আছে? ভাতকে গেঁজিয়ে সাঁওতালরা নিজেরাই পারিবারিক চাহিদা মেটাতে ঘরে হাড়িয়া তৈরি করে।[১৩] প্রকৃত অর্থেই দারিদ্যের যন্ত্রণা, নিষ্পেষণ ও শোষণকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার জন্য, তীব্র হতাশা থেকে অল্পক্ষণের জন্য মুক্তির লক্ষ্যে হাঁড়িয়া খাওয়া ছিল এক কার্যকর উপায়। তারাশঙ্কর তাদের এ অভ্যাসটিকে তুলে ধরেছেন তার উপন্যাসে। *অরণ্য-বহ্নি*তে একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে হাঁড়িয়ার প্রতি সাঁওতালদের আসক্তির কথা।

৪

অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে লেখকের বর্ণনা প্রমাণ করে তাঁর প্রত্যক্ষণের গভীরতা। সাঁওতালদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নিবিড়ভাবে এবং তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তার সাহিত্যকর্মে। সাধারণত সাঁওতাল গ্রামের প্রবেশ মুখে থাকে শালকুঞ্জ যা পরিচিত 'জাহের খান' হিসেবে। তারাশঙ্কর একে 'জহর সর্ণা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাঁওতালদের প্রধান দেবতা মারাঙ বুরু (লেখকের বর্ণনায় মারং বোঙ্গা) এখানে অবস্থান করেন। সাধারণত সাঁওতালদের দেব-দেবীর উদ্দেশে পূজা এই 'জহর সর্ণা'র সংলগ্ন এলাকাতেই অনুষ্ঠিত হয়। গাছের নিচে পূজা করা সাঁওতালদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ। সাঁওতালরা দেবতাকে বলে 'বোঙ্গা'। আর দেবতারা যেখানে থাকেন সেই ঠাঁইকে বলে জহর সর্ণা। (তা.র., পৃ. ৩৪৫)

তারাশঙ্কর সাঁওতালদের প্রধান দেবতা 'মারাং বুরু' বা 'মহাপর্বত' কে 'মারাং বোঙ্গা' বলে উল্লেখ করেছেন। *অরণ্যবহ্নি*-তে তিনি দেখিয়েছেন এই 'বোঙ্গা' বাগনাডিহি গ্রামের সাঁওতালদের কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তাদেরকে একতাবদ্ধ করেছে। সিধু ও কানু 'মারাং বোঙ্গা'র কাছ থেকে ঐশ্বরিক বার্তা পেয়েই হয়ে উঠেছে উদ্যমী, বিদ্রোহী। 'মারাং বোঙ্গা' সাঁওতালদের দুঃসময়ে সিধু ও কানুকে পাঠিয়েছে 'ইশারা'; 'মারাং বোঙ্গার' আবির্ভাব ঘটেছে শোষিত সাঁওতাল সমাজের পরিত্রাণে। আর এ আবির্ভাব সাঁওতালদের মাঝে প্রজ্বলিত করেছে বিদ্রোহের চেতনা:

> সে ঝরনার ধারে এক তীরে বুনোবেড়াল আর খরগোশ মারার কথা বললে — তারপর এই জহর সর্ণার ধারে বসে কালকের জল ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের সেই কামনার কথা জানালে। তারপর সেই বাজ পড়ার কথা বললে — বাজটো পড়ল; সাদা ঝকমকে লালপানিতে সব আঁধার লাগল। ফুল পড়ে গেল ধপাস করে। আমি বসে রইলম হে যেমন ছিলম। মনে হল বিজলী যেন আমার ভিতর ঢুকে গেল। ই ইশেরা আমি বুঝছি হে। মারংবোঙ্গা গাছ থেকে মাটিতে নামল। আবার শি ইশেরা দিবে। ধর তু আমার হাতটো চেপে ধর। দেখ সেই বিজলীর তাত তুর হাত দিয়ে তুর ভিতরে সিঁধায়ে যাবে। ঠিক যাবে। (তা.র., পৃ. ৩৮১)

'মারাং বুরু' বা মহাপর্বত অবশ্য সাঁওতাল সমাজে ঐক্য ও সংহতির পক্ষে প্রত্যক্ষ, প্রকৃত ও সর্বাপেক্ষা বলবান শক্তি। 'মারাং বুরু' হল তাদের সর্বশক্তিমান জাতীয় দেবতা যিনি তাদের সব দেব-দেবীতে সংস্থিত হয়ে আছেন, যিনি তাদের জাতির 'অভিভাবক ও ধর্মপিতা', সমগ্র জাতিকে যিনি এক ধর্মীয়বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন।[১৪] এর পাশাপাশি সাঁওতালরা ডাকিনিবিদ্যাসহ বিভিন্ন তথাকথিত অশুভ শক্তি-তে বিশ্বাস করে। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন কীভাবে হিন্দুধর্মের উপাদান তাদের ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। সাঁওতালদের ধর্মচর্চায় যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা। দুর্গাপূজা তাদের অন্যতম বড়ো উৎসব। পাশাপাশি কালীপূজাও তাদের সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এছাড়াও সাঁওতালদের মধ্যে শিবপূজা ও মনসাপূজার প্রচলন আছে। লেখক বলেন : '— বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি বিজয়া দশমীর দিন সাঁওতালদের মহোৎসব। হাঁড়িয়া খেয়ে, আপন আপন সব থেকে উজ্জ্বল পোশাক পরে, মাথায় ময়ূরের পালক বেঁধে যুদ্ধনৃত্যের প্রমত্ততা' (তা.র., পৃ. ৩২৯)। উপন্যাসের অন্যত্রও তারাশঙ্কর 'মা বোঙ্গার ঠাঁই' বা 'দুর্গাপূজার স্থলে' বিজয়া দশমীর দিনে দলে দলে এসে সাঁওতালদের প্রণাম করে যাওয়ার রেওয়াজের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে 'বোঙ্গার গাছে' বজ্রাঘাত হওয়ায় সমগ্র গ্রামজুড়ে কীরূপ অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। মারং বোঙ্গার গাছে বজ্রপাত সাঁওতালদের করে তুলেছিল ভীত, শঙ্কিত, দ্বিধাগ্রস্ত। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক সিধু এ বজ্রাঘাতকে 'ইশেরা' হিসেবে দেখলেও অনেকেই একে দেখেছিল অশনি সংকেত হিসেবে। সমগ্র গ্রাম জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল এক ভীতিজনক পরিস্থিতি। 'চূড়া মাঝির মা' এই ঘটনাকে দেখেছে সর্বনাশের আগমনবার্তা হিসেবে। তার সাথে পুরোপুরিভাবে একাত্মতা ঘোষণা না করলেও 'গ্রামজুড়ে এই মন্দ কথা' অনেককেই করেছে বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত। মারং বোঙ্গার বাসস্থানের উপর প্রকৃতির

এই রুষ্টতা তাদেরকে অস্থির ও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে — বোঙ্গার ও তাঁর ক্ষমতার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থাই এই বিভ্রান্তি ও শঙ্কার মুখ্য কারণ।

হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথার প্রভাব সাঁওতালদের মাঝে অনুপস্থিত ছিল। উঁচু জাতের হিন্দু বা 'দিকু'দের প্রতি সাঁওতালরা গভীরভাবে সন্দিগ্ধ থাকলেও নিম্নবৃত্তির নিচুজাতগুলোর সাথে কালক্রমে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১৫] লোহাররা তাদের অস্ত্র নির্মাণে সাহায্য করত, কামাররা কৃষি উপকরণসহ তীরের ফলা তৈরি করত। মগরা ও ডোমেরা বাঁশ বা বেতের বিভিন্ন গৃহস্থালী-দ্রব্য প্রস্তুত তো করতই, পাশাপাশি বিয়ে, উৎসব, শিকার বা যুদ্ধযাত্রায় বাজনা বাজাতো। *রাঢ়ের সমাজ: অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ* গ্রন্থে রঞ্জন গুপ্ত উল্লেখ করেছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দুর অভিমত। তার ভাষ্য অনুযায়ী, বিদ্রোহের সময় ডোম, কলু, নাপিত, কামার, গোয়ালা, কাহার (পাল্কিবাহক) প্রভৃতি নিম্নজাতের জনগণকে সাঁওতালরা আক্রমণ করত না। কারণ এদের দ্বারা সাঁওতালদের উপকার হত।[১৬]

সমাজের নিষ্পেষিত শ্রেণি হিসেবে সাঁওতালরা নিচুস্তরের হিন্দুগোত্রীয় মানুষদের ভেবেছে সমপর্যায়ের। অত্যাচার ও নিপীড়ণ তাদের সত্তাকে একীভূত করেছে, — আর তাই সাঁওতাল বিদ্রোহে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রমাণও মেলে। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের যে চিত্র রূপায়িত হয়েছে তাতে তাদের সমাজের বর্ণবৈষম্যহীন রূপ ফুটে উঠেছে। বিদ্রোহের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সাঁওতালদের প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্বলিত হয়েছে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ — নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হয়নি সে বিদ্রোহে :

> সেই ঠিক বর্ষা নামব নামব করছে — নামছে — সেই সময় কানু সিধুর দল — সে দল কম নয় — কেউ বলে বিশ হাজার, কেউ বলে ত্রিশ হাজার নিয়ে পিয়ালপুরে পাহাড়ের উপর আড্ডা গাড়লে। এদিকে তাদের সাহেবগঞ্জ থেকে বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধার পর্যন্ত একরকম দখল হয়ে গিয়েছে। সাঁওতাল ছাড়া মানুষজন ভদ্রলোক বামুন কায়েত বদ্যি সদগোপ এরা দেশছাড়া হয়েছে। ছোট জাত যাদের বলি আমরা — বাউড়ী, বাগ্দী ডোম ধোপা এদের ওরা কিছু বলে নি। আর বলেনি কামারদের। তাদের তীরের ফলা যোগাতে হত।
>
> (তা.র., পৃ. ৪৩৯-৪১)

৫

নৃবিজ্ঞানীগণ মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিষয় অনুসন্ধানে ব্রতী হন। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নৃবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় holistic approach বা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। নৃবিজ্ঞানের একটি এথনোগ্রাফিক গবেষণায় স্থান পায় কোনো নৃগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ জীবন-ব্যবস্থা। আর তাতে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। *অরণ্য-বহ্নি*তে সাঁওতালদের ঐতিহ্যিক রাজনৈতিক জীবনকে লেখক চিত্রিত করেছেন, একই সাথে দেখিয়েছেন প্রচলিত রাজনেতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। সাঁওতালদের গ্রাম-প্রধানকে বলা হয় মাঝি। মাঝি পদ অবশ্য সম্মানসূচক, এর সঙ্গে পদাধিকারী ও অধস্তনদের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো বৈষম্য ছিল না — সবাই একসঙ্গে

পানাহার করত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধও চলত।[১৭] মাঝির চেয়ে উচ্চতর অবস্থান হল পরগানায়েৎ। এ পদ নির্বাচনমূলক, একজন পরগানায়েৎ-এর অধীনে থাকত বারোটি গ্রাম — কখনো ৩০ থেকে ৪০ জন মাঝি।[১৮] পরগানায়েৎ-এর কাজ ছিল মাঝিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে বৈধ কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করা। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। তবে সাঁওতালরা যেহেতু 'সাধারণভাবে একটি সুশৃঙ্খল জাতি' সেজন্য 'সম্মানবহন এবং খাজনা আদায় ছাড়া তাদের আর প্রায় কিছুই করতে হতো না'।[১৯] *অরণ্য-বহ্নিতে* দেখা যায়, সিধু-কানুর পিতা চুনার মুর্মু গ্রামের সর্দার। এর পাশাপাশি গোটা সাঁওতাল সমাজে সে সম্মানিত লোক। বুড়ো চুনার মাঝির উপাধিটি হলো মুর্মু ঠাকুর (তা.র., পৃ. ৩৪৮)। মুর্মু উপাধিটি মূলত ব্যবহৃত হয় সাঁওতাল পুরোহিতদের জন্য। চুনার মুর্মুর দাবী, তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজা। ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাদের স্থান হয়েছে বাগনাডিহিতে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাঁওতালরা তাকে সম্মান করে, পরামর্শ গ্রহণের জন্য তার কাছে আসে। যে-কোনো সমস্যার সমাধানে অথবা বিবাদ-মীমাংসায় চুনার মুর্মুর বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব পেত :

> '... দশ বিশখানা গ্রামের সাঁওতালরা তার কাছে আসে পরামর্শ শলার জন্য। এই জহর সর্ণার পাশে ওই যে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর আছে ওই পাথরটির ঠিক মাঝখানটি চুনার মাঝির জন্য নির্দিষ্ট। তার দু দিকে ডান বাঁ পাশে আধগোল হয়ে বসে অন্যান্য মুর্মু উপাধিধারী সর্দাররা, তারপর অন্যান্য সর্দার মাঝিরা। বিবাদে বিসংবাদে বিচারের শেষ কথা বলে চুনার মুর্মু ঠাকুর। (তা.র., পৃ.৩৪৫-৪৬)

গ্রাম পত্তনের পরেই এই পঞ্চায়েত বা পরগানায়েৎ মূলত নির্বাচিত হত, এ ব্যবস্থা ছিল বংশানুক্রমিক। গ্রামের মধ্যস্থলে কোনো গাছতলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা বসত। ব্রিটিশদের আরোপিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তারা প্রসন্ন চিত্তে কখনোই গ্রহণ করেনি। বরং নিজেদের প্রচলিত ব্যবস্থাই তারা আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে। দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত, পুলিশ ও দারোগার প্রতাপ তারা কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

সাঁওতালদের নিজস্ব রাজনৈতিক জীবনাদর্শ থাকলেও বাইরের শক্তির আগ্রাসনে দুর্বল হয়ে পড়ে তার ভিত্তি। সাঁওতালদের অভিভাবক 'পান্টিন' সাহেবও তাদের দুর্দশা ঘোচাতে পুরোপুরি ব্যর্থ ছিলেন। উপরন্তু তাদের শোষণ ও অত্যাচার করেছে হিন্দু মহাজন, পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং রেল লাইনে নিযুক্ত ইয়োরোপীয়রা। এমনকী সাঁওতালদের পরগানায়েৎ নির্বাচনের দায়িত্বও চলে আসে পটেন্ট সাহেবের হাতে। নিজস্ব গণ্ডিতে সহজ সরল জীবনধারণে অভ্যস্ত সাঁওতালরা বাধ্য হয় বহিঃশক্তির কাছে আত্মসমর্পণে। ব্রিটিশদের আরোপিত শাসনব্যবস্থা মেনে নিলেও তার সাথে কখনোই একাত্ম হতে পারেনি সাঁওতালরা।

সাঁওতাল সমাজ পুরুষতান্ত্রিক হলেও নারীদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সাঁওতাল নারী পরজীবী নয়, আত্মনির্ভরশীল। পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকর্মে পুরুষের সমান সক্রিয় তার ভূমিকা।[২০] সাঁওতাল পরিবার-কাঠামোতে অর্থনৈতিক কাজকর্মে নারী পুরুষের ভূমিকা প্রায় সমান। এমনকী লিঙ্গ নির্বিশেষে সাঁওতাল শিশুরা পর্যন্ত সংসারের কাজকর্মে

যথাসাধ্য সাহায্য করে। সাঁওতাল নারীরা গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখে। সাঁওতাল সমাজের শ্রমবিভাজন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তারাশঙ্করের বর্ণনায় :

> মেয়েরা ঘরের কাজে ব্যস্ত হল। পুরুষেরা গরু বাছুর মহিষ ছাগল ভেড়া ছেড়ে দিলে। বাঁধা রইল শুধু চাষের কাঁড়া আর দামড়াগুলো। গিদ্‌রা অর্থাৎ বাচ্চা ছেলেগুলো তাদের নিয়ে চলল গ্রামের ধারে। মাঠে ঘাস খাবে। মুরগীগুলোকে ছাড়লে। মরদেরা তামাকপাতা পলাশপাতায় জড়িয়ে চুটি বানিয়ে চকমকির আগুনে ধরিয়ে ভাঙা ডাল পরিষ্কার করতে লাগল।
>
> (তা.র., পৃ. ৩৫০)

৬

সংস্কৃতি অধ্যয়নে আগ্রহী নৃবিজ্ঞানীরা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়, আচার-অনুষ্ঠান গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন। সংস্কৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও দৃষ্টি এড়ায় না তাদের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় *অরণ্য-বহ্নি*তে সাঁওতাল জীবনচর্চাকে রূপায়ণ করেছেন নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। তাই তাঁর সাহিত্য রচনায় সাঁওতাল জীবন ও সংস্কৃতির এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থানে তিনি সক্ষম হয়েছেন। সাঁওতালরা ঐতিহ্যগতভাবে নাচ-গান ভালোবাসে। আবালবৃদ্ধবণিতা বছরের যে-কোনো সময়েই মনের ইচ্ছানুযায়ী দলবদ্ধভাবে নাচ-গান করে থাকে। 'কাঁধে ধনুকটা ঝুলিয়ে কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশীটা টেনে নিয়ে পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে সুর তুলে ওদের গান ভাঁজতে ভাঁজতে চলে যাবে নিজেদের গাঁয়ে। (তা.র., পৃ. ৩২৪) নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তৈরি হাঁড়িয়া নামক মদ খাওয়ার সাথে সাথে নাচ-গানে মেতে ওঠা সাঁওতাল জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বহুকাল ধরে এ চর্চা অব্যাহত রেখেছে তারা। তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন সাঁওতাল অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যের কথা। তিনি সাঁওতালদের বিভিন্ন প্রকার গানের কথা উল্লেখ করেছেন :

> বিভিন্ন পর্বে ওদের বিভিন্ন গান — এমনকি সকল সময়ে গাইবার গান — লাগ্‌ড়ে সিরিং। বিয়ের গান — রাপ্‌লা সিরিং। বীজ ছড়াবার বা ধান ভানবার গান — রহয় সিরিং। ঋতুর গানও আছে। (তা.র. পৃ. ৪৩২)

সাঁওতালদের মধ্যে পাঁচ রকমের নাচ সর্বাধিক প্রিয় — (১) নাগড়ে নাচ, (২) দাসাই নাচ, (৩) সহরাই নাচ, (৪) দং নাচ ও (৫) বাহা। তারাশঙ্কর সাঁওতালদের নাচের প্রতি অনুরাগের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন — দেখিয়েছেন রুকনী, টুকনীর নাচ কীভাবে বিমোহিত করেছে সিধু-কানুদের। আবার দেখিয়েছেন '... সন্ধ্যাবেলা হাড়িয়া জম করে নাচনের সময় সিধু যখন মাদল বাজায় তখন সব মেয়ের মধ্যে সে-ই (সিধুর স্ত্রী ফুল) মেতে ওঠে বেশী।' (তা.র., পৃ. ৩৫১)

কালী পূজার সময় তারা যে নাচ নেচে আমোদ করে তাকে 'সহরাই' নাচ বলে। সাঁওতালরা প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রপঞ্চকে কেন্দ্র করে পালন করে নানা উৎসব। বীজ বপনের সময় তারা 'এরক্ সিম' উৎসব পালন করে। বীজ বপন শেষ হলে 'হারিয়ার সিম' উৎসবে মেতে ওঠে। শস্য কাটার সময় তারা পালন করে 'জানথার উৎসব'। বসন্তের

আগমনের সময় সাঁওতালরা উৎসবের ভেতর দিয়ে প্রকৃতি দেবীকে পূজা করে। 'বাহা' সাঁওতালদের অতি পবিত্র ধর্মীয় উৎসব। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে 'বাহা' উৎসব আরম্ভ হয়।

*অরণ্য-বহ্নি*তে সাঁওতালদের আতিথেয়তার কথা বলা হয়েছে। স্বভাবতই সহজ সরল সাঁওতালরা অতিথিপরায়ণ। উপন্যাসের শুরুতে লেখক দেখিয়েছেন মোটরগাড়ি বিকল হবার পর কীভাবে সাঁওতালরা তাকে অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উপন্যাসের অন্যত্র এ আতিথেয়তার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক, '... এই এমনি করে ওরা খুব আপনার লোককে গান গেয়ে মাটিতে বসায়; নইলে অবিশ্যি মাদুর পেতে খাতির করে কুটুমদের বসায়' (তা.র., পৃ. ৩৭৭-৭৮)। সাঁওতালরা তাদের গৃহে আসবাবপত্রের আধিক্য পছন্দ করে না। তালপাতা কিংবা খেজুরপাতার মাদুর ও দড়ির খাটিয়া প্রত্যেক বাড়িতেই ব্যবহৃত হয়। লোকজন আত্মীয়-স্বজন এলে খাটিয়া পেতে দেওয়া হয়।[২১] মাদল বাজিয়ে গান গেয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ:

> সন্ধ্যে তখন হয়ে এসেছে, মাদল পেড়ে লাল বলেছিল — কুটুম এল গান কর হে। পেথম আইছে কুটুম।... লাল বললে — সন্ধ্যের সময় কুটুম এল — ওরে বউ পাটি আন — পিড়ে আন — পেতে দে বসতে দে। (তা.র., পৃ. ৩৭৭)

নৃবিজ্ঞানীরা কোনো symbol বা প্রতীকের নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোনো নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অভ্যন্তরীণ অর্থ বা inner meaning-কে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালান। এ ধারাকে প্রতীকী নৃবিজ্ঞান (symbolic Anthropology) বলা হয়। তারাশঙ্করের *অরণ্য-বহ্নি*তে উল্লেখিত হয়েছে সাঁওতাল সমাজে সাদা, কালো ও লাল এই তিন রং-এর প্রতীকী তাৎপর্যের কথা। নৃ-বিজ্ঞানী ভিক্টর টানার আফ্রিকার এনডেম্বু (Ndembu) নৃ-গোষ্ঠীর তিন রং সম্পর্কিত ধারণার কথা বলেছেন — যেখানে সাদা শুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রতীক, লাল রং একাধারে শক্তিমত্তা ও বিপদের প্রতীক এবং কালো রং অশুভ শক্তির ধারক। *অরণ্য-বহ্নি*তে সাঁওতালদের তিন রং সম্পর্কিত ধারণাও অনেকটা এর কাছাকাছি :

> চুনার মুর্মু এতক্ষণ ধরে সেই ফাটলের ধারে কয়েকজন প্রৌঢ় ধার্মিক সাঁওতালদের নিয়ে বসে ভিতরের জল পড়া দেখছিল। দেখছিল জলটার রঙ কিরকম — লালচে না কালচে না সাদা। লালচে কালচে জল বের হলে সে লক্ষণ শুভ নয়। কালচে কাদাগোলা জল হলে অজন্মা হবে, লালচে হলে মহামারী হবে, সাদা হলে ভালো — সু বর্ষা হবে। (তা.র., পৃ. ৩৪৮)

৭

তারাশঙ্কর *অরণ্য-বহ্নি*তে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ওপর হিন্দু মহাজন এবং ব্রিটিশদের অবর্ণনীয় নিষ্পেষণের কাহিনী বিধৃত করেছেন। একদিকে 'দিকু'দের শোষণ ও নিষ্পেষণ, অন্যদিকে ব্রিটিশদের অবিচার, অত্যাচার সহজ সরল এই আদিবাসীদের জীবনকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিল। 'দিকু' ব্যবসায়ী ও মহাজনরা এসেছিল মূলত বাংলার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা থেকে। বাংলার বাইরে থেকেও এসেছিল অনেকে ।

শাহাবাদ, ছাপড়া, বোতরা, আরা, এমনকি রাজস্থান ও গুজরাট থেকেও তারা আসে।[২২] মাড়োয়ারি-গুজরাটিসহ ভিন্ন প্রদেশের বণিক-ব্যবসায়ী মহাজনরা সাধারণত 'ভাটিয়া' নামে পরিচিত। এরা সবাই এসেছিল সাঁওতালদের সরলতা ও বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসার নামে নির্লজ্জভাবে ওদের ঠকিয়ে দ্রুত ধনী হতে। ১৮৫৬ সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় একজন নিবন্ধকার লেখেন, 'যেদিন থেকে বাইরের এসব বণিকরা পাহাড়ে তাদের আস্তানা গাড়লো সেদিন থেকেই সাঁওতালদের অবস্থার ধীর কিন্তু গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা।'[২৩] *অরণ্য-বহ্নিতে* তারাশঙ্কর 'দিকু'দের এই অসাধুতার কথা, সাঁওতাল নিগ্রহের কথা তুলে ধরেছেন। সিধু আর তার অনুগামীরা তাদের আরণ্য দ্রব্য — কেড়ে ঘি, বাঘনখ, ময়ূরের পালকের গুচ্ছ — নিয়ে গিয়েছিল বারহেটের বাজারে, উদ্দেশ্য এগুলির বিনিময়ে ধাতুর মুদ্রা সংগ্রহ করে কিছু নুনসহ কিনবে দু-একটা শখের জিনিস। ভকত ব্যবসায়ী এবং বাজারের বিক্রেতারা সবাই জোচ্চুরি করে সিধুদের ঠকাল ওজনে ও দামে।[২৪] মহাজনরা দু-ধরনের বাটখারা ব্যবহার করে সাঁওতালদের ঠকাত। একটি 'কেনারাম', ফসল কেনা বা দেনা শোধের বাটখারা; অপরটি 'বেচারাম' জিনিস বেচা বা ধারের ধানমাপার বাটখারা। প্রথমটি সাধারণ বাটখারার চেয়ে ওজনে অবশ্যই অনেক ভারী, দ্বিতীয়টি অনেক হালকা।[২৫] তাছাড়া দুধ বা ঘি মাপার পাত্রের তলায় মহাজনরা ছিদ্র রেখে দিত,ফলে পাত্র কিছুতেই পূর্ণ হত না। তারাশঙ্কর *অরণ্য-বহ্নিতে* দেখিয়েছেন :

> নুনের বাটখারা আলাদা। ধান যে বাটখারায় নেয় সে বাটখারা নয়। ছোট আলাদা বাটখারা। সরকারী আবগারী বাটখারা। সবাই বলে আলাদাই বটে। (তা. র., পৃ. ৩৫৫)

তারাশঙ্কর *অরণ্য-বহ্নিতে* বর্ণনা করেছেন কীভাবে কেনারাম ভকতের মতো অসাধু মহাজনরা মাত্র দশ টাকায় মানুষ কেনে। অভাবের তাড়নায় অথবা কোনো উৎসব আয়োজনে কিংবা মহাজনদের মিথ্যা প্রলোভনে, তারা কেনারাম ভকতের মতো দিকু মহাজনদের কাছ থেকে ধান-চাল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা টাকা-পয়সা ধার করত। যা ধার করত তার সঙ্গে বছর শেষে যোগ হতো ৫০ বা ৫০০ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ।২৬ মাত্র কয়েক আনা কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে যেত কয়েকশো বা হাজার টাকা, যা শোধ করার সামর্থ্য সাঁওতালদের ছিল না। ধার শোধে ব্যর্থ সাঁওতালদের তখন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে হত 'ভকতে'র মতো মহাজনদের বাড়িতে। সাঁওতালদের শোষণ করে বিত্তশালী হওয়া কেনারাম ভকতের বাড়িতে বরকন্দাজ আছে, লাঠিয়াল আছে, কাজেই 'সবার টিকি তার কাছে বাঁধা'। এভাবেই *অরণ্য-বহ্নিতে* পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে 'দিকু' মহাজনদের নিষ্ঠুরতার কথা, সাঁওতালদের শোষিত হবার কথা, মাত্র দশ টাকায় মানুষ বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা :

> সে লোকটার বাড়ি সাহেবগঞ্জের দিকে। সে ভকত বাড়ির চাকর আজ সাত বছর। বাপ মরার সময় গেল (দশ) টাকা ধার করেছিল ভকতের কাছে... সেই টাকা শোধ করার জন্য আজও খাটছে। সে খাটে, তার স্ত্রী খাটে। খাবার ধান পায়। বাস্ । আর কিছু না। লোকটার নাম নিমু হাঁসদা। (তা.র., পৃ. ৩৪৫-৫৫)

নিজেদের চিরচেনা অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে-পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতালরা হয়েছিল বিপন্ন। তার পাশাপাশি অন্যায়ভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত হওয়ায় তাদের জীবন হয়ে

উঠেছিল দুর্বিষহ। বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে এসে, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে সহজ সরল সাঁওতালরা সুযোগসন্ধানী অসাধু দিকুদের দ্বারা বারংবার প্রতারিত ও নিষ্পেষিত হয়েছিল। মহাজনদের এই অমানবিক আচরণ পরবর্তীকালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ত্বরান্বিত হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। *অরণ্য-বহ্নিতে* হিন্দু মহাজনদের নিষ্ঠুরতার কথা এবং সাঁওতালদের অসহায়ত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে স্পষ্টভাবে :

> ওদের মধ্যে একজন ছিল লক্ষ্মণ — সে ছোকরা মানুষ, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে — উরা রাক্ষস বেটে সিধু ভাই, উরা রাক্ষস বেটে। রাক্ষসে হাড় মাস খায়, লহু চাটে — ই রাক্ষসরা সারা জীবন খেয়ে দেয় হে। তবু ছাড়ে না? এই দেখ কেনে ভাই, আমার বাবা দেনা নিয়েছিল এই এক কায়েত দিকুর কাছে 'গেল' টাকা (দশ টাকা) তা বাবা মরে গেইছে — আমি খাটছি। চাষে খাটি — ধান সব উই লেয়। তবু শেষ হয় নাই। হবেক না। (তা.র., পৃ. ৩৫৯)

অরণ্য-বহ্নিতে দেখা যায়, অত্যাচারিত এবং শোষিত সাঁওতালরা খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্ররোচনায় ধর্মান্তরিত হচ্ছে দলে দলে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও স্বাভাবিক দারিদ্র্যমুক্ত জীবনধারণের অনিবার্য তাগিদে তারা নিজেদের প্রচলিত ধর্মকে বিসর্জন দিচ্ছে। সচ্ছল জীবনের আশা এবং চরম দারিদ্র্যের অভিশাপ তাদের বাধ্য করেছে পাদরিদের খ্রিষ্টান হবার আহ্বান মেনে নিতে। খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া সাঁওতালদের সম্পর্কে বাগনাডিহির যুবক লক্ষ্মণ বলছে, "তারা খুব টাকাওলা লোক। পাদরীদের সঙ্গে ভাব। কেরেস্তান হইছে। পোশাকের বাহার হইছে। পাদরীদেগে নিয়ে এল। পাদরীকে কে কি বলবেক? পুড়খানা জেটেরা খুনের জাত হে। বন্দুক দিয়ে গুলায়ে দেয়।" (তা.র., পৃ. ৩৬১)

নৃবিজ্ঞানীরা সমগ্র বিশ্বজুড়েই ঔপনিবেশিক আমলে ধর্মান্তরের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া — সমগ্র বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক আমলে ইয়োরোপীয় ধর্মযাজকরা মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। মিশনারিদের কাছে সাহায্য পাবার আশায়, দারিদ্র্য ও নিষ্পেষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তথাকথিত 'নেটিভ'রা স্বীয় ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের ঐতিহ্যিক সত্তাকে করেছে ক্রুশবিদ্ধ। স্বীয় সংস্কৃতি, বিশ্বাসের মৃতদেহকে পদদলিত করে তারা ছুটে গিয়েছিল জ্বলন্ত ক্রুশের দিকে। তাদের এ অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি Ethrocide বা সংস্কৃতি-হত্যায় মেতে ওঠেছিল। এ ধারাতেই ব্রিটিশ ধর্মযাজকরা সাঁওতালদের অসহায়ত্বের সুযোগ কাজে লাগিয়েছে, প্ররোচিত করেছে খ্রিষ্টান হতে। এর এক যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে আবার সেই লক্ষ্মণের কণ্ঠে :

> লক্ষ্মণ বললে — সাঁওতালরা বাঁচবেক নাই হে। মরবেক। বিলকুল সব মেরেই ফেলাবে হে। এক রক্ষে কিরিস্তান হলে। পাদরী বাবারা খানিক আদেক দেখে। (তা.র., পৃ. ৩৬৪)

৮

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নৃতাত্ত্বিকরা দেখেছেন কীভাবে বৃহৎ সংস্কৃতি ক্ষুদ্র সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখা গিয়েছে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক রূপান্তর। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রভাবে পরিবর্তন এসেছে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক জীবনে। বৃহত্তর হিন্দুসমাজেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। আরণ্যক জীবনে অভ্যস্ত সাঁওতালরা সমতলে জমি আবাদ করার মাধ্যমে সম্পৃক্ত হয়েছে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে — পরিচিত হয়েছে ভিন্নতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে। তাদের দীর্ঘদিনের চর্চিত জীবনাচরণ ও লালিত সংস্কৃতি বৃহত্তর সমাজের প্রভাবে হয়েছে পরিবর্তিত। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাদের চিরচেনা জীবনাচরণে বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমশ হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রক। খ্রিষ্টান হওয়ার পরে তারা ত্যাগ করেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতে বোনা একখণ্ড বস্ত্র পরার রেওয়াজ ... 'তারা লিখাপড়ি করছে। কুর্তা পরে তারা, দিকুদের মত কাপড় পরে।' (তা.র., পৃ. ৩৭৪) পাদরিদের খত নিয়ে বর্ধমান মুলুকে 'রাস্তাবন্দিতে' গিয়ে রেলের কোম্পানিতে কাজ করেছে তারা। প্রচলিত কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সাঁওতালদের একাংশ যোগ দিয়েছে রেল লাইনের কাজে। উইলিয়াম হান্টার তাঁর *এ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল* গ্রন্থে লিখেছেন, "... ১৮৫৪ সালে এমন ঘটনাবলী ঘটলো যা বাংলাদেশে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিল পুঁজির সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক।"২৭ রেললাইন স্থাপনের কাজে প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের চাহিদার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রেলের ঠিকাদারদের সংগৃহীত সাঁওতালরা, স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ লেগে গেল রেললাইন স্থাপনার কাজে। আর রেললাইনে কাজ পাওয়ার সুযোগ ত্বরান্বিত হত খ্রিষ্টান হয়ে পাদরির অনুমোদন নিয়ে এলে। রেললাইনে কর্মরত সাঁওতালদের তথাকথিত 'স্বাধীন' জীবন বিস্ময় ও ঈর্ষা সৃষ্টি করেছিল অন্য সাঁওতালদের মনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেললাইনে কর্মরত সাঁওতালদের জীবন কখনোই সুখকর ছিল না। বিপুল সংখ্যক রেল শ্রমিকের মজুরি যোগাতে গিয়ে জেলায় খুচরো মুদ্রার দারুন অভাব দেখা দেয় এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়।২৮ পাশাপাশি একথাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তথাকথিত 'স্বাধীন' শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ঠিকাদারদের দাদন-খাওয়া মজুর, বাকি অংশ দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত অস্থায়ী শ্রমিক। সমসাময়িক একটি ইংরেজি সংবাদপত্র অনুযায়ী রেল কোম্পানি বহু সাঁওতালকে মজুরি না দিয়ে বেগার খাটিয়েছে।২৯ পাশাপাশি রেললাইনে নিযুক্ত ইয়োরোপীয়রা সাঁওতালদের জীবনে যোগ করেছিল বাড়তি দুর্ভোগ এবং অশান্তি। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন কীভাবে রেল লাইনে নিযুক্ত সাহেবদের হাতে তিন সাঁওতাল নারী (মানকী, রুকনী ও টুকনী) অপহৃত ও অত্যাচারিত হয়েছিল।

১৮৩৮ সালে এক সরকারি আদেশের বলে জেমস পটেন্ট হলো 'দামিন-ই-কোর' সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর প্রতি নির্দেশ হল তিনি যেন সরকারের স্বার্থ রক্ষা করে সাঁওতালদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত ও খাজনা আদায় করেন।[৩০] কিন্তু সাঁওতালদের অভিযোগ দূর করা তো দূরের কথা, তাদের অভিযোগ ঠিকমতো শোনার সময় বা সুযোগ ছিল না পান্টিন সাহেবের। সাঁওতালদের আবাসস্থল থেকে সরকারি আমলারা থাকতেন অনেক দূরে সদর শহরে। বহু যোজনের দূরত্ব, দুর্গম পথ-ঘাট পেরিয়ে সেখানে যাওয়ার পরও দেখা যেত সাঁওতালদের মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য নেকড়ের মতো অপেক্ষা করে আছে ধূর্ত ও লোভী সরকারি আমলাকুল, মোক্তার, পিয়ন, বরকন্দাজ ও দালালের দল। ঘরের কিছুটা কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আইনানুগ এজেন্ট হল পুলিশ ও দারোগা। কিন্তু তারাই

সাঁওতালদের সর্বনাশের মূল কারণ। অধিকাংশ পুলিশ সদস্যই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। *অরণ্য-বহ্নিতে* তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন কীভাবে মহেশ দারোগা সাঁওতালদের উৎপীড়ন করেছে ... কীভাবে অর্থের লোভে পুলিশবাহিনী দিকু মহাজনদের সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে।

অরণ্য-বহ্নিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মনন, অভিজ্ঞতা ও সাহিত্য প্রতিভার প্রয়োগে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দিক ও জীবনচর্চার উপন্যাস-সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন । এর সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটেছে ঐতিহাসিক উপাদানের। ঐতিহাসিক উপাদানের পর্যালোচিত অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগ এবং সুগভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তির যথার্থ ব্যবহারে *অরণ্য-বহ্নি* হয়ে উঠেছে সাঁওতাল সংস্কৃতির এক গতিময় আখ্যান। আর তাঁর এই সৃজনশীল সাহিত্যিক গতিময়তা সুগভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তি অভিভূত করেছে নৃবিজ্ঞানীদের। নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় তাই *অরণ্য-বহ্নি* হয়ে উঠেছে প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর জীবনচর্চা, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের এক অনন্য দলিল। সাহিত্য ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে এক সুনিপুণ যোগসূত্র স্থাপন করেছে এই উপন্যাস। আর এ উপন্যাসের গভীর অধ্যয়ন, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন নৃ-বিজ্ঞানীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে করবে আরো বাস্তবমুখী, তাঁদের মননকে করবে গতিময় ও ভবিষ্যৎ প্রসারী।

তথ্যনির্দেশ

১. Rose De Angelis (edited), *Between Anthropology and Literature; Interdisciplinary Discourse,* Routhledge, London and Newyork, 2001, p. 2.

২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪. দুলাল দাস, 'উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল জাতি'; রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৭৫

৫. রঞ্জন গুপ্ত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৮৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "অরণ্য-বহ্নি" *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ভাদ্র ১৩৮৭, পৃ. ৩২৩। অতঃপর এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাস থেকে সকল উদ্ধৃতি *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* অষ্টাদশ খণ্ড, থেকে গ্রহণ করা হবে। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে তা.র. ব্যবহার করা হবে।

৮. উদ্ধৃত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

৯. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

১০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

১১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "স্মৃতি সত্তার আগ্নেয় হদিশ : 'অরণ্য-বহ্নি'", প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য,* সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১,নতুন দিল্লী, পৃ. ১৩৫

১২. দুলাল দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

১৩. উদ্ধৃত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

১৪. রঞ্জন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

১৬. উদ্ধৃত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১
১৭. উদ্ধৃত. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
১৮. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
১৯. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০
২০. রঞ্জন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫
২১. দুলাল দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
২২. উদ্ধৃত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১
২৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১
২৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫
২৫. উদ্ধৃত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭
২৬. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২
২৭. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮
২৮. রঞ্জন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
২৯. উদ্ধৃত, *রাঢ়ের সমাজ : অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
৩০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭